অধ্যায় - ২৬

১) ভক্ত পন্ত ২) হরিশচন্দ্র পিত্‌লে ও ৩) গোপাল আম্বেদকরের কাহিনী

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে স্থূল, সূক্ষ্ম, চেতন ও জড় ইত্যাদি যা কিছু দেখা যায়, সে সব একই ব্রহ্ম এবং এই এক ও অদ্বিতীয় বস্তু ব্রহ্মকে আমরা বিভিন্ন নামে সম্বোধিত করি এবং ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখি। আমরা যেমন অন্ধকারে পড়ে থাকা একটা দড়ি বা মালাকে ভুলবশতঃ সাপ বলে মনে করি, ঠিক সে ভাবেই সমস্ত পদার্থের কেবল বাহ্য রূপটিই দেখে, তাদের সত্য স্বরূপটি ভুলে যাই। একমাত্র সদ্‌গুরুরই আমাদের দৃষ্টি থেকে মায়ার আবরণ সরিয়ে বস্তুগুলির সত্য স্বরূপের যথার্থ দর্শন করাতে পারেন। তাই আসুন, আমরা শ্রী সদ্‌গুরু সাই মহারাজের উপাসনা করে তাঁকে সত্যর দর্শন করাবার জন্য প্রার্থনা করি, যিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ নন।

আন্তরিক পূজন ঃ-

শ্রী হেমাডপন্ত উপাসনার এক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি উল্লেখ করছেন। উনি বলেন যে, সদ্‌গুরুর পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্তে আনন্দাশ্রুর উষ্ণ জল ব্যবহার করো। তাঁকে শুদ্ধ প্রেমরূপী চন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে, দৃঢ় বিশ্বাস রূপী বস্ত্র পরাও। অষ্ট সাত্বিক ভাব রূপী আটটি পদ্মফুল ও একাগ্র চিতরূপী ফল তাঁকে অর্পণ করো। নিষ্ঠারূপী অভ্রচূর্ণ তাঁর কপালে লাগিয়ে ভক্তির ধুতি পরিয়ে, নিজের মাথা তাঁর চরণতলে রাখো। এই ভাবে শ্রী সাইকে সমস্ত আভরণে ভূষিত করে, তাঁকে নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করে দাও। উষ্ণতা দূর করার জন্য সর্বদা ভক্তির চামর দোলাও। এই ভাবে সানন্দে পূজো করে প্রার্থনা করো-

"হে সাই! আমাদের প্রবৃত্তি অন্তর্মুখী করে দাও। সত্য এবং অসত্যের বিবেক দাও এবং সাংসারিক পদার্থ থেকে আসক্তি দূর করে আমাদের আত্মানুভূতি প্রদান করো। আমরা নিজেদের দেহ ও প্রাণ আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করছি। হে সাই! আমাদের দৃষ্টি তুমি নিজের করে নাও, যাতে আমাদের আর সুখ-দুঃখ অনুভব না হয়। হে সাই! আমার শরীর ও মনকে তুমি নিজের ইচ্ছে অনুসারে চালাও ও আমার চঞ্চল মনকে

তোমার পদতলে বিশ্রাম করার জায়গা দাও।"

এবার আমরা এই অধ্যায়ের কাহিনীগুলির দিকে আসি।

ভক্ত পন্ত ঃ-

একবার পন্ত নামক এক ভক্তের, যিনি অন্য একজন সদ্‌গুরুর শিষ্য ছিলেন, শিরডী আসার সৌভাগ্য হয়। ওঁর শিরডী আসার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু 'মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক'। একদিন ট্রেনে অনেক বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে হঠাৎ ওঁর দেখা হয়। ওঁরা সকলেই শিরডী যাচ্ছিলেন। পন্তকে ওঁদের সাথে শিরডী যেতে অনুরোধ করেন। পন্ত এই প্রস্তাব অস্বীকার করতে পারেন না। অন্যান্য সকলে বম্বেতে নামেন কিন্তু পন্ত বিরারে নেমে নিজের গুরুর কাছে শিরডী প্রস্থান করার অনুমতি নেন এবং আবশ্যক খরচা আদির ব্যবস্থা করে সবার সাথে শিরডী রওনা হন। প্রাতঃকালে শিরডী পৌঁছে বেলা ১১টা নাগাদ মস্‌জিদে যান। ওখানে পূজোর জন্য একত্রিত ভক্তদের সমূহ দেখে সবাই খুব প্রসন্ন হন কিন্তু পন্ত হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তখন সবাই ওঁকে সুস্থ করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বাবার কৃপায় ও মাথায় জলের ছিটে দেওয়ায় উনি সুস্থ হয়ে উঠে বসেন, যেন কেউ ঘুম থেকে উঠে বসেছে। উনি অন্য গুরুর শিষ্য, একথা জানার পর ত্রৈকালজ্ঞ বাবা ওঁকে অভয় দান করে ওঁর গুরুর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করে বলেন- "যাই ঘটুক না কেন, নিজের স্তম্ভকে দৃঢ় ভাবে ধরে রেখো। সর্বদা স্থির হয়ে তাঁর সাথে অভিন্নতা প্রাপ্ত করো।" পন্ত তক্ষুনি এই শব্দগুলির অর্থ বুঝে যান এবং ওঁর নিজের সদ্‌গুরুর কথা মনে পড়ে। বাবার এই করুণার কথা ওঁর জীবনভোর মনে থাকে।

শ্রী হরিশচন্দ্র পিত্‌লে ঃ-

হরিশচন্দ্র পিত্‌লে বম্বেতে থাকতেন। ওঁর ছেলে মৃগী রোগে ভুগছিল। অনেক রকমের দেশী ও বিদেশী চিকিৎসা করিয়েও কোন লাভ হয় না। এবার শুধু একটা উপায়ই বাকী ছিল - কোন মহাপুরুষের চরণের আশ্রয় নেওয়া। ১৫ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রী দাসগণুর সুমধুর কীর্তনের মাধ্যমে শ্রী সাইবাবার কীর্তি বম্বেতে ভালই ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯১০ সালে পিত্‌লে বাবার কীর্তন শোনেন ও উনি জানতে পারেন যে, শ্রী সাইবাবার করস্পর্শ ও দৃষ্টি দ্বারাই অসাধ্য রোগ সমূলে নষ্ট হয়ে যায়। তখন ওঁর মনেও শ্রী সাইবাবাকে দর্শন করার তীব্র ইচ্ছে জাগে। যাত্রার ব্যবস্থা করে, উপহার দেওয়ার জন্য ফলের ঝুড়ি হাতে করে বৌ ও বাচ্চাদের নিয়ে উনি শিরডী

আসেন। মস্‌জিদে পৌঁছে চরণ বন্দনা করে নিজের রোগী পুত্রকে বাবার চরণতলে রাখলেন। বাবার দৃষ্টি ওর উপর পড়তেই ওর মধ্যে এক বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে। ছেলেটির চোখ দুটি ঘুরতে লাগল। ওর মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরোতে লাগলো ও শরীর ঘামে ভিজে গেল। মনে হচ্ছিল যেন এবার প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে। ওর বাবা-মা অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েন। ছেলেটি মাঝে-মাঝে অজ্ঞান তো হত কিন্তু এবার যেন বেশীক্ষনের জন্য মূর্চ্ছা গেল। মায়ের চোখ থেকে ঝর-ঝর করে জল পড়ছিল। দুঃখে আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন- "আমি এমন অবস্থায় পড়েছি যেন কেউ চোরের ভয়ে যে বাড়ীতে প্রবেশ করল সেই বাড়ীটাই তার উপর ভেঙ্গে পড়ল; যেন কোন গরু বাঘের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে কসাই এর হাতে পড়ল; রৌদ্রদগ্ধ পথিক শীতল ছায়ার আশায় গাছতলায় দাঁড়ালে সেই গাছই তার মাথায় পড়ল।" তখন বাবা ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- "এমন বিলাপ কোর না। ধৈর্য্য ধরো। ছেলেটিকে ঘরে নিয়ে যাও। আধ ঘন্টার মধ্যেই এর জ্ঞান ফিরে আসবে।" বাবার আদেশ ওঁরা তৎক্ষনাত পালন করেন। বাবার কথাই সত্য প্রমাণিত হয়। ছেলেটি সুস্থ হয়ে ওঠে। পিত্‌লে পরিবার ও অন্যান্য সবাই অতিশয় প্রীত হন। ওঁদের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গিয়েছিল। শ্রী পিত্‌লে সস্ত্রীক বাবার দর্শন করতে আসেন এবং অতি বিনম্র হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক বাবার চরণ বন্দনা করেন। বাবাকে মনে-মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান। তখন বাবা হেসে জিজ্ঞাসা করেন- "তোমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও সংশয় কেটে গেছে তো? যাঁদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস আছে, তাঁদের শ্রীহরি রক্ষা করেন।" শ্রী পিত্‌লে ছিলেন অবস্থাপন্ন লোক। তাই উনি ঢালাওভাবে মিষ্টি বিতরণ করেন এবং চমৎকার ফল ও পান বাবাকে অর্পণ করেন। শ্রীমতি পিত্‌লে সাত্বিক প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। ওঁর চোখ থেকে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের অশ্রুধারা বইছিল। ওঁর মৃদু ও সরল স্বভাব দেখে বাবা প্রসন্ন হন। ঈশ্বরের ন্যায় সন্তরাও ভক্তদের অধীন। যারা তাঁর শরণাগত হয়ে অনন্য ভাবে তাঁরই পূজো করে, তাদের রক্ষা সন্তগণ নিশ্চয়ই করেন। শিরডীতে কিছুদিন সুখে-শান্তিতে থেকে পিত্‌লে পরিবার প্রস্থান করার অনুমতি নেওয়ার জন্য বাবার কাছে মস্‌জিদে যান। বাবা ওদের 'উদী' দিয়ে আশীর্বাদ করে শ্রী পিতলেকে কাছে ডেকে বলেন, "বাপু, এর আগে আমি তোমায় দু টাকা দিয়ে ছিলাম, এবার আমি তোমায় তিন টাকা দিচ্ছি। নিজের পূজোর জায়গায় রেখে রোজ এই টাকাগুলির পূজো কোর। তাতে তোমার মঙ্গল হবে।" শ্রী পিত্‌লে সেগুলি প্রসাদ রূপে গ্রহণ করেন। বাবাকে পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে আশীষের জন্য প্রার্থনা করেন। হঠাৎ ওঁর মনে হল, উনি এই প্রথম শিরডীতে এসেছেন, তাহলে বাবার' দু টাকা আগে দিয়েছি' বলার অর্থ কি?

উনি এই প্রশ্নের স্পষ্টিকরণ আশা করছিলেন, কিন্তু বাবা চুপ করেই বসে রইলেন। বম্বে পৌছে উনি নিজের বুড়ী মাকে শিরডী যাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত শোনান এবং ঐ দু টাকার কথাও বলেন। মাও প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করার পর একটা পুরোন ঘটনা মনে পড়ে। ওঁর মা বলেন- "তুমি তোমার নিজের ছেলেকে নিয়ে যেমন শ্রী সাইবাবার দর্শন করতে গিয়েছিলে, তোমাকে নিয়ে তোমার বাবা তেমনি অনেক বছর আগে আক্কালকোট মহারাজের দর্শনে গিয়েছিলেন। মহারাজ পূর্ণ সিদ্ধ, যোগী, ত্রিকালজ্ঞ ও বড়ই উদার হৃদয়ের মহাপুরুষ ছিলেন। তোমার বাবাও ওঁর পরম ভক্ত ছিলেন, তাই ওর পূজো স্বীকৃত হয়। সেই সময় মহারাজ ওঁকে দুটো টাকা বেদীতে রেখে পূজো করার জন্য দিয়েছিলেন। উনি আজীবন সেই ভাবে পূজো করে যান। ওঁর মৃত্যুর পর সেই টাকাগুলির যথাবিধি পূজো হতে পারে না এবং টাকা দুটি হারিয়ে যায়। কিছুদিন পর আমি সেগুলির কথা একেবারেই ভুলে যাই। তোমার খুব সৌভাগ্য যে, শ্রী আক্কালকোট মহারাজ সাই রূপে তোমায় তোমার কর্তব্য ও পূজোর কথা স্মরণ করিয়ে তোমায় সব বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন। এবার ভবিষ্যতে সজাগ থেকে সমস্ত সংশয়, চিন্তা ভাবনা ছেড়ে নিজের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে, রীতি ইত্যাদি অনুসরণ করে সদাচারী হও। নিজের কুলদেবতা ও এই টাকাগুলির পূজো করে তাঁর যথার্থ স্বরূপটি বুঝে, সন্তদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে গর্ব বোধ করো। শ্রী সাই সমর্থ দয়া করে তোমার মনে ভক্তির বীজ রোপন করেছেন। তোমার কর্তব্য হল তার বৃদ্ধিতে সহায়ক হওয়া। মায়ের কথা শুনে শ্রী পিত্‌লে অত্যন্ত খুশী হন। বাবার সর্বকালজ্ঞতার পরিচয় উনি পেয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর শ্রী দর্শনের মাহাত্ম্য বুঝতে পারেন। এরপর থেকে উনি নিজের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বেশী সাবধান হলেন।।

শ্রী আম্বেডকর ঃ-

পুণের শ্রী গোপাল নারায়ণ আম্বেডকর বাবার একজন পরম ভক্ত ছিলেন। ইনি ঠানের জেলার ও জওহর স্টেটের আবগারী (মদ্য প্রস্তুতকারী) বিভাগে দশ বছর ধরে কাজ করেন। সেখানে থেকে অবসর গ্রহণ করার পর উনি অন্য চাকরী খোঁজেন কিন্তু সফল হন না। দুভার্গ্য ওঁকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে নেয় এবং ওঁর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাবে উনি সাত বছর কাটান। উনি প্রত্যেক বছর শিরডী যেতেন এবং নিজের দুঃখের কাহিনী বাবাকে শোনাতেন। ১৯১৬ সালে ওঁর দুরবস্থা যখন চরমে দাঁড়ায় তখন উনি শিরডী গিয়ে আত্মহত্যা করবেন স্থির করেন। এই ভেবে

উনি নিজের স্ত্রীর সাথে শিরডী আসেন এবং সেখানে দু মাস থাকেন। একদিন রাতে দীক্ষিত 'ওয়াড়া'র সামনে গরুর গাড়ীতে বসে বসে উনি কূয়ায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করবেন স্থির করেন এবং এদিকে বাবা ওঁকে রক্ষার ব্যবস্থাটা ঠিক করে রাখেন। এমন সময় কাছের এক ভোজনালয়ের মালিক শ্রী সগুণমেরু নায়ক বাইরে এসে আম্বেডকরকে জিজ্ঞাসা করেন -

"আপনি কখনো শ্রী আক্কালকোট মহারাজের জীবনী পড়েছেন?" আম্বেডকর তখন সগুণের কাছ থেকে বইটা নিয়ে পড়তে শুরু করেন। বইটা পড়তে-পড়তে একটি বিচিত্র ঘটনায় পৌঁছে উনি হতবাক্ হয়ে যান - আক্কালকোট মহারাজের জীবিতকালে একটি লোক এক অসাধ্য রোগে ভুগছিল। যখন কোন ভাবেই আর কষ্ট সহ্য করতে পারা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন একেবারে নিরাশ হয়ে সে কূয়োয় লাফিয়ে পড়ে। তক্ষুনি মহারাজ সেখানে পৌঁছে স্বয়ং হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে তোলেন। তিনি ওকে বোঝান যে **"নিজের শুভ-অশুভ কর্মের ফল ভোগ করতেই হয়। ভোগ সম্পূর্ণ না হলে নতুন জন্মধারণ করতে হয়। তাই আত্মহত্যা না করে কিছু কাল সেগুলি সহ্য করে পূর্ব জন্মের কর্মফল ভোগ জন্মের মতো শেষ করে দিয়ে যাও।"** এই রকম সাময়িক এবং উপযুক্ত ঘটনা পড়ে আম্বেডকর খুবই অবাক হন।

গল্পের মাধ্যমে বাবার নির্দেশ না পেলে এতক্ষণে ওঁর জীবন শেষ হয়ে যেতো। বাবার সর্বব্যাপকতা ও করুণার পরিচয় পেয়ে ওঁর বিশ্বাস সুগভীর হল। ওঁর পিতা শ্রী আক্কালকোট মহারাজের শিষ্য ছিলেন এবং তাই বাবা চাইতেন যে, উনি ওঁর পিতারই পদচিহ্ন অনুসরন করুন। বাবা ওকে আশীর্বাদ দেন ও তার ভাগ্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উনি জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে অনেক উন্নতি করেন। অনেক ধন উপার্জন করে শেষজীবন সুখে-সাচ্ছন্দ্যে কাটান।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।